লিভার ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ

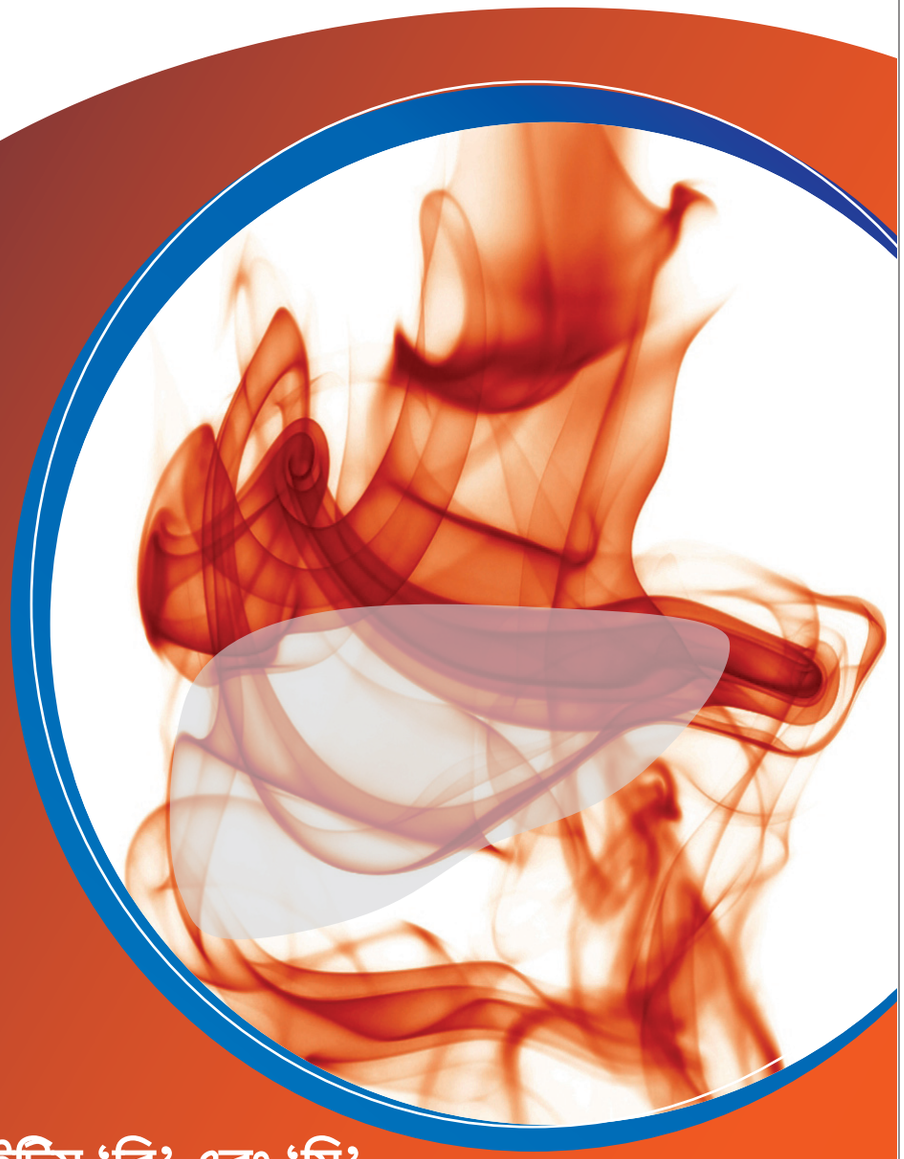

হেপাটাইটিস ‘বি’ এবং ‘সি’ গাইডবুক

আপনার লিভার - যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়

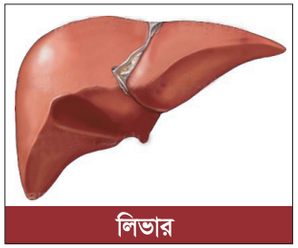

লিভার, বাংলায় যাকে বলা হয় যকৃৎ। লিভার আমাদের শরীরের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, যা ৫০০ এর বেশী অতি প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন করে। লিভার কে শুধুমাত্র একটি অঙ্গই বলা হয় না, বরং এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্ল্যান্ড বা গ্রন্থি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কেননা লিভার থেকে হজমের সাথে সংশ্লিষ্ট অনেক রকম পদার্থ নিঃস্বরণ হয়। এই অতীব প্রয়োজনীয় অঙ্গটি যদি জীবাণু দ্বারা বা অসুখে আক্রান্ত হয় তাহলে মানুষের জীবন বিপন্ন হয়ে ওঠে।

লিভার এর অবস্থান

পেটের উপরিভাগে ডান দিকে ‘ডায়াফ্রেম’ (মাংসের শক্ত পর্দা, যা বক্ষকে পেট থেকে আলাদা করে) এর নীচে পাকস্থলী, কিডনি ও নাড়ীভূরির উপড়ে বক্ষ অস্থির ভিতরে সুরক্ষিত অবস্থায় এর অবস্থান। লিভারের প্রধান দুটি অংশ হলো ডান লোব আর বাম লোব। একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির লিভারের ওজন হয় প্রায় ১.৫ কেজি।

লিভার এর কার্যক্রম

লিভার আমাদের শরীরে একটি জটিল বায়োকেমিক্যাল ফ্যাক্টরী বা কারখানা বিশেষ, যেখানে অনেক কিছু **উৎপাদন**, **সংরক্ষন** এবং **বিশুদ্ধকরণ** হয়ে থাকে। লিভারের কোন অংশ কোন রোগ বা অপারেশনের মাধ্যমে অপসারণ করলে, লিভারের বাকি অংশ থেকে দ্রুত লিভার টিস্যু বৃদ্ধি (Regenaration) পেয়ে আক্রান্ত স্থান ও কার্যক্রম পূর্ণ করে।

লিভার কি উৎপাদন করে

খাদ্য হজমে লিভারের ভূমিকা অপরিসীম। খাদ্যকে ভেঙ্গে তাকে শক্তিতে রুপান্তরিত করে। এছাড়াও বাইল বা পিত্ত তৈরি করে যা খাদ্য হজমে এবং ভিটামিন শরীরে ধারনে সাহায্য করে, কলেসট্রোল তৈরি করে যা আমাদের শরীরে কোষ গুলোর স্বাস্থ্য রক্ষায় ও বিভিন্ন হরমোন তৈরিতে কাজে লাগে, ট্রাইগ্লিসারাইড তৈরি করে যা শরীরের কোষ এর জন্য ভালো, গ্লাইকোজেন হিসাবে গ্লুকোজ (যা শরীরের প্রধান শক্তির উৎস) মজুদ করে এবং প্রয়োজনের সময় নিঃসরণ করে, এ্যালবোমিন (Albumin) সহ ব্লাড প্রোটিন তৈরি করে যা রক্তে ফ্লুইড এর অবস্থান ঠিক রাখে এবং রক্তে লিপিড (ফ্যাট) এর মাত্রা নিয়ন্ত্রন করে।

লিভার কি সংরক্ষণ করে

রক্ত জমাট বাধতে সাহায্য করে। লিভার অনেক রকমের প্রোটিন তৈরির করে যা রক্ত জমাট বাধতে সাহায্য করে। প্রয়োজনের তুলনায় কম অথবা বেশী প্রোটিন থাকলেও রক্তক্ষরন বন্ধ বা রক্ত জমাট হবার প্রক্রিয়ায় ব্যঘাত ঘটায়।

ভিটামিন এবং মিনারেল সংরক্ষণ করে। এছাড়াও আয়রন, কপার এবং বিভিন্ন রকম ভিটামিন যেমন ভিটামিন এ, বি১২, ডি, ই সংরক্ষণ করে এবং শরীরের প্রয়োজনের সময় সরবরাহ করে।

লিভার কি বিশুদ্ধকরন করে

শরীরে প্রবেশকৃত এবং বিদ্যমান সবধরনের কেমিক্যেলই (যেমন এ্যালকোহল, ঔষধ, পোকামাকড় মারার স্প্রে এবং অনান্য কেমিক্যেল) বিশুদ্ধ (Detoxification) করে। এ্যলকোহল সেবন এর পর লিভার এর ক্ষতিকারক কেমিক্যেল বিশুদ্ধ করে ঠিকই কিন্তু অধিক মাত্রায় সেবনের পর এই এ্যলেকোহল বিশুদ্ধকরন করতে লিভার অকার্যকর হয়ে পরে। অনেক সময় চিকিৎকের পরামর্শ ছাড়া ঔষধ, ভেজাল ঔষধ অথবা খোলা বাজারে বিক্রত বিভিন্ন রকম অনুমোদনহীন ঔষধ গ্রহনের পর সেগুলো তখনই সক্রিয় হয় যখন লিভার তা বিশুদ্ধকরন করে প্রস্তুত করে। কিছু ঔষধ লিভারের জন্য খুবই বিষাক্ত এবং এক সাথে কয়েক রকমের ঔষধের কম্বিনেশন বা একসাথে মিলিয়ে খাওয়া ভয়ঙ্কর ভাবে লিভারের কার্যক্রম ব্যহত করতে পারে।

এছাড়াও শরীরের অপ্রয়োজনীয় উচ্ছিষ্ট গুলোকে লিভার কাজে লাগাতে সাহায্য করে। এমোনিয়া (প্রোটিন ভেঙ্গে তৈরি হয়) কে ইউরিয়াতে রুপান্তরিত করে যখন তা রক্ত থেকে বের হয়ে যায়। বিলিরুবিন (যখন শরীর পুরাতন রেড ব্লাড সেল বা লাল রক্ত কনিকা ধংস করে তখন তৈরি হয়)কে রুপান্তরিত করে পরিপাকতন্ত্রের মাধ্যমে শরীর থেকে বের করতে সাহায্য করে।

হেপাটাইটিস এর কারনে যখন বিলিরুবিন এর মাত্রা শরীরে বেড়ে যায় তখন হলুদ বর্ণ চামড়া বা চোখ (জন্ডিস) দেখা যায় ।

লিভার, রক্তে কিছু হরমোন এর মাত্রা নিয়ন্ত্রন করে বিশেষ করে যৌন হরমোন গুলো যেমন টেসটেরন অথবা এসট্রোজেন ।

লিভার শরীরে প্রবেশকৃত জীবাণু ধ্বংস করে। হোয়াইট ব্লাড সেল বা সাদা রক্ত কণিকা মাঝে মাঝেই বিভিন্ন রকম ব্যকটেরিয়া এবং জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং লিভার তা প্রতিহত করার জন্য যুদ্ধ চালিয়ে যায়।

"অনেক ব্যক্তিই বুঝতে পারেন না যে তার লিভার অকার্যকর হয়ে পরছে। লিভার খুবই শক্তিশালী, এমনকি অকার্যকর অবস্থাতেও এটা শরীরের প্রয়োজন অনুযায়ী কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু ধারাবাহিক ভাবে লিভার এর ক্ষতিসাধন হতে থাকলে, লিভার তার কার্যক্ষমতা হারায়।"

আপনার লিভার এর যত্ন

আপনি যদি ভাইরাল হেপাটাইটিস এ আক্রান্ত হন, তখন আপনার লিভার দুর্বল অবস্থায় থাকে। সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনার লিভারের যত্ন নেওয়া উচিৎ যেন তা আরও দুর্বল, প্রদাহ বা অকার্যকর না হয়ে পরে। নিম্নক্ত বিষয়গুলো অনুসরন করে আপনার লিভারের যত্ন নেওয়া সম্ভব:

- হেপাটাইটিস 'এ' এবং হেপাটাইটিস 'বি' টিকা নেওয়ার ব্যপারে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
- নেশা জাতীয় দ্রব্য ব্যহারে অন্যের ব্যবহৃত সূচ, সিরিঞ্জ, তুলা, পানি, পাইপ, কুকার্স কখনই ব্যবহার করা উচিৎ না।
- অন্যের ব্যবহৃত টুথব্রাস, রেজার, ব্লেড, ক্ষুর, হাত-পা এর যত্ন (মেনিকিওর , পেডিকিওর) নেবার জিনিস কখনই ব্যবহার করা উচিৎ না, যদিও বা তাতে রক্ত না থাকুক বা আপনি রক্ত না দেখেন।
- মদ্যপান পরিহার করুন। এ্যালকোহল আপনার লিভার সিরোসিস এবং লিভার ক্যান্সারের সম্ভাবনা অনেকাংশে বাড়িয়ে দেয়।
- ভাইরাল হেপাটাইটিস সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান রাখেন এমন চিকিৎসকের পরামর্শ নিন যেমন : গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজীস্ট, হেপাটোলজীস্ট, সংক্রামক ব্যধি বিশেষজ্ঞ। কিছু প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী চিকিৎকও ভাইরাল হেপাটাইটিস চিকিৎসা সম্পর্কে আপনাকে সঠিক পরামর্শ দিতে পারে।
- নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করুন। আপনার শরীরের অনান্য অঙ্গ প্রতঙ্গেরও পরীক্ষা করান এবং খেয়াল রাখুন।
- সুসম খাবার গ্রহন করুন যেমন টাটকা শব্জি, ফলমূল, গম ইত্যাদি।
- অধিক মাত্রায় লবন, চিনি এবং ফ্যাট জাতীয় খাবার পরিহার করুন।
- পর্যাপ্ত পরিমানে পানি পান করুন যা আপনার শরীর থেকে দূষিত দ্রব্য বের করে দিতে সাহায্য করবে। এটা হেপাটাইটিস চিকিসার ক্ষেত্রেও সহায়ক হবে।
- নিয়মিত শরীর চর্চা করুন এবং শারীরিক ও মানসিক চাপ কামনো চেষ্টা করুন।
- চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া অযোথা ঔষধ খাবেন না এবং এ ব্যপারে অবশ্যই সতর্ক থাকুন।
- অধিক ডোজ এর ভিটামিন (ভিটামিন এ, ডি, ই এবং কে) খাবেন না বা খাবার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
- হারবাল মেডিসিন গ্রহনের আগে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন কারন কোন কোন হারবাল মেডিসিন আপনার লিভার এর ক্ষতির কারন হতে পারে। যে সমস্ত হারবাল লিভারের ক্ষতির পরিমান বাড়িয়ে দিতে পারে সে গুলো পরিহার করুন যেমন: পিপারমিন্ট, মিস্ট্রেটো, ইয়ার্বা টি, সাস্সাফ্রাস, গারমেন্ডার, চাপারাল, স্কাল ক্রাপ, ন্যাটমেগ, ভেলেরিয়ান, জিন বু জুয়ান, কমফ্রি (বুশ টি), প্যানির্য়াল এবং টেন্সি রাগওয়ার্থসেনা।
- চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া আয়রন সাপ্লিমেন্ট বা আয়রন টেবলেট সেবন করবেন না, অধিক মাত্রায় আয়রন আপনার লিভার এর ক্ষতি করবে।

লিভার ফাংশন টেস্ট

চিকিৎসকেরা প্রায়ই হেপাটাইটিস আক্রান্ত রোগীদের 'লিভার ফাংশন টেস্ট (Liver Function Test - LFT) ' বা 'লিভার প্যানেল' নামক রক্তের পরীক্ষা করতে দেন। এই টেস্ট লিভারের স্বাস্থ্য সম্পর্কে ধারনা দেয় বা লিভারের স্বাস্থ্যের অবস্থা নির্ণয়ে সহায়ক ভূমিকা পালন করে । এই টেস্ট সরাসরি লিভারের সম্পর্কে তথ্য না দিয়ে, লিভারের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় গুলোর তথ্য দেয়, যা থেকে লিভারের কার্যক্রম স্বাভাবিক আছে কিনা তা নির্ণয় করা যায়। লিভারের একটি ছোট্ট অংশ নিয়ে (লিভার বায়প্সি (Liver biopsy) প্রকৃত পক্ষে ক্ষয়কৃত লিভার এর প্রকৃত অবস্থা নির্ণয় করে।

লিভার ড্যামেজ বা অকেজ হয়ে পরলে 'লিভার বায়প্সি (Liver biopsy)' এর প্রয়োজন হয়।

লিভার ফাংশন টেস্ট এ যে সব টেস্ট গুলো করা হয়

ALT - **এএলটি** (এলানাইন এ্যমিনোট্রান্সফারেস) হল একটি লিভার সেলে প্রস্তুতকৃত এনজাইম যা লিভারে ড্যামেজ বা প্রদাহ জনিত কারনে বেড়ে যায়। এছাড়াও এএলটি বেড়ে যাওয়ার কারন লিভারে ফ্যাট এর পরিমান বৃদ্ধি, ঔষধের প্রতিক্রিয়া জনিত, এ্যালকোহল, হেপাটাইটিস ভাইরাস এবং অনান্য লিভার রোগ।

AST - **এএসটি** (এসপারেট এ্যমিনোট্রান্সফারেস) হলো এনজাইম যা অনেক টিসুতে পাওয়া যায়। লিভারে বা অন্যান্য অঙ্গে প্রদাহের কারনে এএসটির মাত্রা বেড়ে যায়।

ALP - **এলপি** (এ্যলকালাইন ফসফাটেস) একটি এনজাইম যা নানাবিধ লিভার রোগের কারনে বাড়তে পারে এনজাইমের বৃদ্ধি পিওনালী (Biliary Free) এর সমস্যা চিহ্নিত করে।

GGT - **জিজিটি** (গামা গ্লুটামেল ট্রান্সপ্যাপটিডেস) একটি এনজাইম যা বিভিন্ন লিভার রোগের কারনে বাড়তে পারে বিশেষ করে এ্যালকোহলিক লিভার ডিজিজ ফ্যটি লিভার এর কারনে। এছাড়াও নিয়মিত প্রচুর পরিমান এসপার্টাসি (আর্টিফিসিয়াল সুইটেনার) সেবন করলেও তা বাড়তে পারে।

Albumin - **এলবুমিন** হলো একটি প্রোটিন যা লিভারে তৈরি হয়। রক্তে এলবুমিনের পরিমান কম পাওয়া গেলে বুঝতে হবে লিভার ঠিকমত কাজ করছে না। সাধারনত খুব বেশী পরিমানে লিভার ড্যামেজ না হলে এলবুমিনের মাত্রা স্বাভাবিক থাকে।

PT-Time, Prothorombin time (clotting studies) - **পিটি-টাইম, প্রথ্রমবিন টাইম (ক্লটিং স্টাডি)** বলতে বুঝায় রক্ত জমাট বাধতে কত সময় লাগছে । রক্ত জমাট বাধার ক্ষেত্রে

লিভারে কয়েকটি উপাদান অতন্ত্য গুরুত্বপূর্ণ এবং যদি প্রথ্রমবিন টাইম বেড়ে যায় তাহলে তা লিভার ড্যামেজ এর ইঙ্গিত দেয়। বিভিন্ন রকম ঔষধও প্রথ্রমবিন টাইম বাড়ায়।

Bilirubin - **বিলিরুবিন,** একটি হলুদ পিগমেন্ট যা রেড ব্লাড সেল বা লহিত রক্ত কনিকা ভেঙ্গে যাওয়ার সময় তৈরি হয়। কিছু লিভার রোগ বিলিরুবিন বাড়ার পেছনে ভূমিকা রাখে। এছাড়াও শরীরের অনান্য রোগের কারনেও বিলিরুবিন বেড়ে যায়।

Platelet count - **প্লাটিলেট কাউন্ট,** প্লাটিলেট ছোট রক্তের সেল যা রক্ত জমাট বাধতে সহায়তা করে। কখনও কখনও প্লাটিলেট কমে যাওয়া লিভার ড্যামেজের ইঙ্গিত দেয়।

এগুলো ছাড়াও লিভার ড্যামেজের আশংকা হলে, হেপটাইটিস ভাইরাস টেস্ট, লিভার আল্ট্রাসাউন্ড এবং কোন ক্ষেত্রে লিভার বায়প্সি এর প্রয়োজন হয়।

"আমরা আপনাকে অনুরোধ করবো আপনার সবগুলো পরীক্ষার রিপোর্ট গুলো সযত্নে রাখার কারন পরবর্তীতে এই রিপোর্ট গুলো দেখে আপনি আপনার লিভারের কার্যক্রম পর্যবেক্ষন করতে পারবেন।"

ভাইরাল হেপাটাইটিস

ভাইরাল হেপাটাইটিস হলো ভাইরাল ইনফেকশনের কারনে সৃষ্ট "লিভারের প্রদাহ বা ইনফ্লামেশন" বিশেষ করে হেপাটাইটিস ভাইরস। লিভারে প্রদাহ বা ইনফ্লামেশন এর প্রধান কারনগুলির মধ্যে পরজীবি সংক্রমন যেমন: ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া , প্রটোজোয়া ইত্যাদি। এছাড়া এলকোহল, ড্রাগস, মেটাবলিক কারনেও হেপাটাইটিস হতে পারে। ভাইরাল হেপাটাইটিস এর ক্ষেত্রে ভাইরাস শুধুমাত্র লিভারের সেল গুলোকেই আক্রমন করে। বাংলাদেশে বিদ্যমান হেপাটাইটিস ভাইরাস গুলো হলো হেপাটাইটিস এ, হেপাটাইটিস বি, হেপাটাইটিস সি এবং কিছু ক্ষেত্রে হেপাটাইটিস ডি এবং হেপাটাইটিস ই ভাইরাস সংক্রমন।

ভাইরাল হেপাটাইটিস সংক্রমন দুই ধরনের হয় 'স্বল্পমেয়াদী বা একিউট (acute) ইনফেকশন' আর 'দীর্ঘমেয়াদী বা ক্রনিক (chronic) ইনফেকশন'।

সবগুলো হেপাটাইটিস ভাইরাসই লিভার কে আক্রান্ত করে কিন্তু তাদের মধ্যে বিভিন্ন রকম পার্থক্য আছে যেমন:

- জেনেটিক মেটেরিয়াল
- ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি তে সংক্রমনের ধরন
- ইনকিউবেশন পিরিয়োড (সংক্রমনের সময় থেকে লক্ষন প্রকাশ পর্যন্ত)
- প্রতিশেধোক টিকার সংক্রমন প্রতিরোধে ক্ষমতা
- দীর্ঘমেয়াদী বা ক্রনিক ইনফেকশন এ রুপান্তরিত হবার ক্ষমতা
- লিভার ড্যামেজ বা অকেজ
- লিভার সিরোসিস বা লিভার ক্যান্সারে এ রুপান্তরিত হবার ক্ষমতা এবং চিকিৎসা পদ্ধতিগত।

হেপাটাইটিস 'এ' 'বি' এবং 'সি'

পাঁচ রকমের হেপাটাইটিস ভাইরাস আছে, সেগুলো হলো হেপাটাইটিস 'এ' 'বি' এবং 'সি' যা বাংলাদেশে খুবই প্রচলিত এবং হেপাটাইটিস 'ডি' এবং 'ই' যা তুলনামুলক ভাবে খুব কম দেখা যায়। প্রত্যেকটি ভাইরাস ই লিভার কে আক্রান্ত করে কিন্তু তাদের ধরন আলাদা। হেপাটাইটিস 'বি' এবং 'সি' সম্পর্কে এই বই এ পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে এখন হেপাটাইটিস 'এ' 'বি' এবং 'সি' সম্পর্কে একটা সংক্ষিপ্ত ধারনা দেওয়া হল।

হেপাটাইটিস 'এ' : হেপাটাইটিস 'এ' ভাইরাস মানকদেহ থেকে অপসারিত মল থেকে বংশবিস্তার করে। এই ভাইরাস সংক্রমিত হয় দূষিত খাবার ও পানি থেকে। সারা বিশ্বেই এই ভাইরাস পাওয়া যায় কিন্তু এটা বেশী মাত্রায় পাওয়া যায় সে সব দেশে যেখানে সেনিটেশন সিস্টেম বা পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা সন্তোষজনক নয়। হেপাটাইটিস 'এ' কোন মরনঘাতী রোগ নয় কিন্তু এইচআইভি (HIV) ভাইরাস বা ক্রনিক লিভার রোগ থাকলে বিভিন্ন রকম সমস্যা দেখা দিতে পারে।

হেপাটাইটিস বি : হেপাটাইটিস বি ভাইরাস সংক্রমিত হয় রক্ত ও অনান্য বডি ফ্লুইড দ্বারা। যৌনকর্ম ও মা থেকে জন্মনেওয়া নবজাতকে জন্মের সময় হেপাটাইটিস বি ভাইরাস সংক্রমিত হতে পারে। হেপাটাইটিস বি, এইচঅঅইভি এইডস (HIV AIDS) এর চেয়েও ১০০ গুন বেশী সংক্রামক এবং এর ফলে লিভার ফেইলিওর, লিভার ক্যান্সার, লিভার সিরোসিস এবং মৃত্যু হতে পারে। বেশীর ভাগ হেপাটাইটিস বি আক্রান্ত রোগীর কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না। যদি লক্ষণ দেখাও যায় তা হলো খাবার গ্রহনে অরুচি, দুর্বলতা, বমি বমি ভাব, পেট ব্যথা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে জন্ডিস (চোখ ও শরীরের চামড়া হলুদ বর্ণ হয়ে যাওয়া)।

এই ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হবার প্রথম ০৬ মাস সময় কে বলা হয় স্বল্পমেয়াদী বা একিউট (acute) ইনফেকশন। বেশীর ভাগ ব্যক্তিই এই ০৬ মাসের মধ্যেই হেপাটাইটিস বি ভাইরাস এর সাথে লড়াই করে এবং জয়ী হয়। যারা প্রথম ০৬ মাসে হেপাটাইটিস বি ভাইরাস এর সাথে লড়াই করে জয়ী হতে পারে না তখন তা দীর্ঘমেয়াদী বা ক্রনিক (chronic) ইনফেকশন এ রুপ নেয়। সাধারনত দীর্ঘমেয়াদী বা ক্রনিক ইনফেকশন এ আক্রান্ত ব্যক্তিদের সারা জীবনই এই ভাইরাস শরীরে বহন করতে হয়। এই ভাইরাস সাধারনত অরক্ষিত যৌনকর্ম, একই ইনজেকশন, রেজার, সূচ ও টুথব্রাশ এর বহু ব্যবহার, মা থেকে জন্মনেওয়া নবজাতকে সংক্রমিত হয়। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪-৭% মানুষ এবং গর্ভবতী মাদের মধ্যে প্রায় ৩.৫% হেপাটাইটিস বি ভাইরাসে আক্রান্ত।

হেপাটাইটিস বি প্রতিরোধোক টিকা গ্রহন করে এই ভাইরাস এর সংক্রমন প্রতিহতো করা সম্ভব। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) পরামর্শ অনুযায়ী এই টিকা দিতে হবে ০,১,৬ অথবা ০,১,২ ও ১২ মাসে।

হেপাটাইটিস বি আক্রান্ত গর্ভবতী মায়েদের নবাজাতককে জন্মের ২৪ ঘন্টার মধ্যে হেপাটাইটিস প্রতিশোধক টিকা ও ইমিউনোগ্লোবিউলিন অবশ্যই দিতে হবে।

হেপাটাইটিস সি : হেপাটাইটিস সি ভাইরাস সংক্রমিত হয় রক্ত ও অনান্য বডি ফ্লুইড দ্বারা। এই ভাইরাস যৌনকর্ম ও মা থেকে জন্মনেওয়া নবজাতকে জন্মের সময়ই এই হেপাটাইটিস সি ভাইরাস সংক্রমিত হতে পারে তবে সম্ভাবনা অনেক কম। হেপাটাইটিস সি সংক্রমন দীর্ঘমেয়াদী বা ক্রনিক (chronic) লিভার রোগ, লিভার ক্যান্সার, লিভার সিরোসিস এবং মৃত্যু ঘটাতে পারে। বেশীর ভাগ হেপাটাইটিস সি আক্রান্ত রোগীরই দীর্ঘমেয়াদী বা ক্রনিক (chronic) ইনফেকশন এ আক্রান্ত হন। দুঃখজনক যে হেপাটাইটিস সি প্রতিরোধক টিকা এখনও আবিষ্কার হয়নি।

হেপাটাইটিস বি

Hepatitis B

হেপাটাইটিস বি

হেপাটাইটিস বি ভাইরাস এর কারনে লিভার সেল বা কোশে যে প্রদাহ হয় তাকে হেপাটাইটিস বি বলে। এই ভাইরাস খুব দ্রুত লিভারে ইনফেকশন বা সংক্রমন ছড়িয়ে জীবনের জন্য মারাত্বক হুমকি স্বরূপ লিভার রোগ সৃষ্টি করতে পারে। বেশীর ভাব ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, এই ভাইরাস সংক্রমনের মাধ্যমে খুবই ধীরে লিভার কে অকেজো করে দেয়। লিভার এ প্রদাহ (Hepatitis), লিভার সংকীর্ণ হয়ে যাওয়া ফাইব্রোসিস (Fibrosis), ব্যাপক আকারে লিভার অকেজো করে দেওয়া সিরোসিস (Cirrhosis) এমনকি লিভার ক্যান্সার (হেপাটো সেলুলার কারসিনোমা - Hepatocellular carcinoma) এবং সবশেষে লিভার ফেইলার হতে পারে।

হেপাটাইটিস বি লিভার ক্যান্সারের প্রধানতম কারন এবং বিশ্বে মৃত্যুর প্রধান ১০ টি কারন এর একটি।

হেপাটাইটিস বি ভাইরাস কে **'নীরব ঘাতক'** বলা হয় কারন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য লক্ষনীয় উপসর্গ দেখা যায় না। কিছু ব্যক্তি এই ভাইরাস আক্রমনের কয়েক মাসের মধ্যেই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বডি'স ইম্মিউন সিস্টেম (Body's immune system) এর মাধ্যমে এই ভাইরাস সাথে যুদ্ধ করে তাকে শরীর থেকে বিতাড়িত করে এবং সুস্থ থাকে। যখন কেউ, প্রথম এই ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন একে বলা হয় স্বল্পমেয়াদী বা একিউট (acute) ইনফেকশন কিন্তু যদি এই ভাইরাস কারো রক্তে ছয় (০৬) মাসের অধিক অবস্থান করে তখন একে বলা হয় দীর্ঘমেয়াদী বা ক্রনিক (chronic) ইনফেকশন ।

হেপাটাইটিস বি ভাইরাস শরীরে প্রবেশের পরই রক্তে এর মাত্রা নাটকীয় ভাবে বাড়তে থাকে যতক্ষন না শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বডি'স ইম্মিউন সিস্টেম (Body's immune system), এন্টিবডি তৈরি করে। রক্তে হেপাটাইটিস বি ভাইরাস অবস্থান কালেই কেবল হেপাটাইটিস বি প্রতিশেধোক এন্টিবডি তৈরি হয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা (বডি'স ইম্মিউন সিস্টেম) হেপাটাইটিস বি ভাইরাস এর সাথে লড়াই করে এবং জয়ী হয়। কিন্তু আক্রান্ত ব্যক্তির বয়স এবং অনান্য কারনে যারা হেপাটাইটিস বি ভাইরাস কে প্রতিহত করতে পারেনা, তারা এ ভাইরাস শরীরে সারা জীবন বহন করে। একেই বলে দীর্ঘমেয়াদী বা ক্রনিক ইনফেকশন। হেপাটাইটিস বি ভাইরাস এ আক্রান্ত হবার পর তা দীর্ঘমেয়াদী ইনফেকশন এ রুপান্তরিত হবার আশংকা বয়সের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এর তথ্য অনুযায়ী:

- হেপাটাইটিস বি ভাইরাস এ আক্রান্ত ৯০% নবজাতকের দীর্ঘমেয়াদী ইনকেশন হতে পারে।
- হেপাটাইটিস বি ভাইরাস এ আক্রান্ত ৫০% শিশু (১-৫ বছর) দীর্ঘমেয়াদী ইনকেশন হতে পারে।
- হেপাটাইটিস বি ভাইরাস এ আক্রান্ত ৫-১০% সুস্থ প্রাপ্ত বয়স্কের দীর্ঘমেয়াদী ইনকেশন হতে পারে।

কত সংখ্যক মানুষ হেপাটাইটিস বি ভাইরাস-এ আক্রান্ত ?

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) রিপোর্ট অনুযায়ী বিশ্বে প্রতি বছর ২০০ কোটি মানুষ এই হেপাটাইটিস বি ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়, ৩.৫ কোটি মানুষ দীর্ঘমেয়াদী ইনফেকশন এ আক্রান্ত এবং প্রায় ৫ থেকে ৭ লক্ষ মানুষ মৃত্যু বরণ করে।

বাংলাদেশের প্রায় শতকরা ৪-৭ ভাগ মানুষ হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের বাহক (সঠিক পরিসংখ্যান জানা যায়নি), তাদের মধ্যে অনেকেই দীর্ঘমেয়াদী ইনকেশন এ নানাবিধ জটিল লিভার রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। এ দেশের প্রায় ৩.৫% গর্ভবতী মায়েরা হেপাটাইটিস–বি ভাইরাসে আক্রান্ত এবং এই ভাইরাস তাদের নবজাতকের শরীরে সংক্রামিত হবার আশংকা অনেক বেশী। মনে রাখতে হবে যে, হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস, এইডস ভাইরাসের চেয়ে ১০০ ভাগ বেশী সংক্রামক। পৃথিবীরতে যত মানুষ প্রতি বছর এইডস (AIDS) ভাইরাসে মারা যায় তার চেয়ে অনেক বেশী মানুষ প্রতিদিন হেপাটাইটিস বি এর কারনে মৃত্যুবরন করে।

হেপাটাইটিস বি এর লক্ষণ সমূহ

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই **কোন লক্ষণ থাকে না**। যতক্ষণ না পর্যন্ত চিকিৎসকেরা রক্ত পরীক্ষা করে হেপাটাইটিস বি এর উপস্থিতি নিশ্চিত করেন।

সাধারন লক্ষণ :

- জ্বর
- শারীরিক অবসাদ
- দুর্বলতা
- মাংশপেশী ও হাড়ের জয়েন্ট এ ব্যথা
- বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া

বিরল লক্ষণ :

- ব্যাপক বমি হবার ফলে পানি শূন্যতা
- জন্ডিস (শরীর, চোখ ও গাঢ় মূত্রে হলদেটে ভাব)
- বর্ধিত পেট (এ্যসাইটিস- Ascites)।

হেপাটাইটিস বি ভাইরাস কি ভাবে সংক্রমিত হয়?

হেপাটাইটিস বি ভাইরাস খুবই সংক্রমিত একটি ভাইরাস। আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত বা শরীরের অন্যান্য তরল বডি ফ্লুইড (Body fluid), ভ্যাজাইন্যাল তরল পদার্থ রক্তের সংস্পর্শের মাধ্যমে এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিতে হেপাটাইটিস বি সংক্রমিত করে। যেমন :

- জন্মের সময় - আক্রান্ত মা থেকে নবজাতকে
- সরাসরি রক্ত থেকে রক্তে (নিরীক্ষাবিহীন রক্ত এবং রক্তের উপাদান পরিসঞ্চালন দ্বারা)
- সূচ এর মাধ্যমে (একই সূচ ব্যবহার করে একাধিক ব্যক্তির নেশা জাতীয় দ্রব্যাদি গ্রহনের সময়, নাঁক-কান ফুরানো বা টেটু করানো)
- বিভিন্ন রকম চিকিৎসা (মেডিকেল ও ডেন্টাল) গ্রহন কালে দূষিত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের
- ব্যক্তিগত জিনিস একাধিক ব্যক্তির ব্যবহারের ফলে (যেমন: দাঁতের ব্রাশ, রেজার, ক্ষুর, ব্লেড)
- অরক্ষিত যৌন ক্রিয়া

হেপাটাইটিস বি আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে সামাজিক মেলামেশায় এই রোগ ছড়াতে পারে কি ?

সামাজিক মেলামেশায় (হ্যান্ডশেক, কোলাকুলি) এই রোগ ছড়ায় না। এমনকি হেপাটাইটিস বি আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহার্য দ্রব্যাদি যেমন: গ্লাস, প্লেট, কাপ, চামচ, জামা-কাপড় ইত্যাদির মাধ্যমেও এই রোগ ছড়ায় না। শুধুমাত্র যে সমস্ত দ্রব্য রোগীর রক্তের সংস্পর্শে আসে (ক্ষুর, ব্লেড, রেজার, দাঁতের ব্রাশ, সূচ) সেগুলোর মাধ্যমেই এই রোগ ছড়াতে পারে।

হেপাটাইটিস বি আক্রান্ত হবার ঝুঁকিতে আছেন কারা ?

- হেপাটাইটিস বি আক্রান্ত মায়ের নবজাতক।
- ইনজেকশন দিয়ে যারা নেশা গ্রহন করেন।
- হেপাটাইটিস বি আক্রান্তের পরিবারের ঘনিষ্ঠ জনেরা এবং তার সঙ্গি বা সঙ্গিনী।
- স্বাস্থ্য সেবায় নিয়োজিত কর্মীরা, যারা রক্তের সংস্পর্শে প্রায়শই আসেন, যেমন: শল্য চিকিৎসক, ডায়ালইসিস ইউনিট ও রক্ত সঞ্চালন বিভাগের কর্মীরা, দাঁতের ডাক্তার, সেবিকা ও ধাত্রীগণ।

হেপাটাইটিস বি সংক্রমন কি ভাবে প্রতিরোধ করতে পারি ?

হেপাটাইটিস বি ভাইরাস খুবই শক্তিশালী ভাইরাস, এই ভাইরাস শরীরের বাহিরে থাকা অবস্থাতেও সংক্রমিত হতে পারে, এমন কি ০২ (দুই) সপ্তাহ পর্যন্ত শুকিয়ে যাওয়া রক্ত থেকেও। হেপাটাইটিস বি ভাইরাস প্রতিরোধের সবচেয়ে কার্যকরি ব্যবস্থা হলো প্রতিশেধোক টিকা নেওয়া। আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত বা শরীরের অন্যান্য তরল পদার্থ (বডি ফ্লুইড - Body fluid), ভ্যাজাইন্যাল

তরল পদার্থ এর সংস্পর্শ পরিহার এর মাধ্যমে এই ভাইরাস এর সংক্রমন প্রতিরোধ করা সম্ভব। এছাড়াও রক্ত বা রক্তের উপাদান পরিসঞ্চালনার সময় অবশ্যই পরীক্ষিত স্ক্রিনিং (Screening) রক্ত ব্যবহার করা এবং সেলুনে, হাটে-বাজারে চুল কাটা বা সেভ করার সময় অন্যের ব্যবহৃত ব্লেড, ক্ষুর ব্যবহার করা থেকে বিরত থেকে এই ভাইরাস এর সংক্রমন প্রতিরোধ করা সম্ভব।
হেপাটাইটিস বি আক্রান্ত গর্ভবতী মায়েদের থেকে তাদের নবজাতকে এই ভাইরাস সংক্রমন প্রতিরোধের জন্য নবজাতকের জন্মের ২৪ ঘন্টার হেপাটাইটিস বি প্রতিশোধক টিকা (বার্থডোজ) ও ইমিউনোগ্লোবিউলিন দেওয়া অবশ্যই কর্তব্য।

হেপাটাইটিস বি প্রতিশেধোক টিকা ?

নির্দিষ্ট নিয়মে টিকা গ্রহনের মাধ্যমে হেপাটাইটিস বি প্রতিরোধ করা সম্ভব। মনে রাখবেন টিকা গ্রহনের আগে অবশ্যই হেপাটাইটিস বি স্ক্রিনিং করে নেওয়া উচিৎ। অন্যথায় হেপাটাইটিস আক্রান্ত অবস্থার মধ্যে টিকা দিলে কোন লাভ তো হবেই না বরং সম্পূর্ণ প্রতিরোধক ব্যবস্থার কারনে রোগ জটিল অবস্থায় নির্নিত হতে পারে।

টিকার গ্রহনের নিয়ম: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ অনুযায়ী এই টিকা দিতে হবে- ০,১,৬ অথবা ০,১,২ ও ১২ মাসে। যদি কাঙ্খিত টাইটার অর্জিত না হয়, তবে ৩য় ডোজ এর পর অতিরিক্ত আরও একটি ডোজ (বুস্টার ডোজ) নিতে হবে।

টিকার কার্যকারিতা: সাধারন মানুষের ক্ষেত্রে ৮৫ থেকে ১০০ ভাগ এন্টিবডি প্রস্তুত করার ক্ষমতা এন্টিবডি রেস্পন্স (Antibody response) দেখা যায়। টিকা দেওয়ার ১ থেকে ৩ মাসের মধ্যে এন্টিবডি টেস্ট করে টাইটার এন্টি-এইচ বি এস (Anti-HBs) দেখতে হয়। এন্টি-এইচবিএস ১০০ ইউনিট হলে ভাল, ১০-১০০ ইউনিট হলে মোটামোটি এবং ১০ ইউনিট এর কম হলে অতিরিক্ত আরেকটি ডোজ (বুস্টার ডোজ) নিতে হবে।

হেপাটাইটিস বি এর ল্যবরেটরী রক্ত পরীক্ষা সমূহ

রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে হেপাটাইটিস বি রোগ নির্নয় এবং এর সঠিক চিকিৎসা নির্নয় করা হয়। সাধারণত ৬ মাস পর এই রক্ত পরীক্ষা গুলো আবার কারানো হয় বোঝার জন্য যে, আক্রান্ত ব্যক্তি কি এই ভাইরাস থেকে পরিত্রান পেয়েছে, না কি দীর্ঘমেয়াদী বা ক্রনিক ইনফেকশন এ আক্রান্ত হয়েছে। অনেক সময় ল্যবরেটরী রিপোর্টের সঠিক অর্থ না জানার ফলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে, এমন কি চিকিৎসক ও নার্স দের ক্ষেত্রেও। হেপাটাইটিস বি আক্রান্ত প্রত্যেকেরই উচিৎ, ল্যবরেটরী

রিপোর্ট নিয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছ থেকে সঠিক পরামর্শ নেওয়া । কিছু জরুরী শব্দ যেগুলো হেপাটাইটিস বি রোগ নির্নয় এর ল্যবরেটরী রিপোর্টে পাওয়া যায়:
এন্টিজেন (Antigen) : শরীরের কোন বাহিরের প্রোটিন (ফরেন সাবস্টেন্স) যেমন হেপাটাইটিস বি ভাইরাস এর প্রোটিন কে এন্টিজেন বলে।

এন্টিবডি (Antibody) : হেপাটাইটিস বি এর এন্টিজেন কে প্রতিহতো করার জন্য শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা (বডি'স ইম্মিউন সিস্টেম) যে প্রোটিন তৈরি করে তাকে এন্টিবডি বলে। হেপাটাইটিস বি পরীক্ষা করার বিভিন্ন রকম এন্টিবডি (আইজিএম (IgM) নতুন সংক্রমনের ফলে সৃষ্ট, এবং আইজিজ (IgG) দীর্ঘমেয়াদী হেপাটাইটিস প্রতিরোধের জন্য সৃষ্ট) এর প্রয়োজন হয়।

নিম্নলিখিত এন্টিজেন ও এন্টিবডি গুলো হেপাটাইটিস বি সনাক্তকরনে ব্যবহৃত হয় :

HBsAg - **এইচ বি এস এজি** হেপাটাইটিস বি সারফেস এন্টিজেন (hepatitis B surface antigen): হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের শরীরে এই বিশেষ এন্টিজেন পাওয়া যায়। "পজেটিভ (positive) " অথবা " নেগেটিভ (negative)" রেজাল্ট দ্বারা হেপাটাইটিস বি সংক্রমনের বর্তমান অবস্থা নির্নয় করা হয়। এই এন্টিজেন টি প্রাথমিক অবস্থায় স্বল্পমেয়াদী বা একিউট ইনফেকশন নির্নয় করে এবং কোন শারীরিক লক্ষণ প্রকাশের আগ পর্যন্ত আক্রান্ত ব্যক্তিকে সনাক্ত করে। আক্রান্ত ব্যক্তি সফল ভাবে এই ভাইরাস কে প্রতিহত করতে পারে তবে এইচ বি এস এজি (HBsAg) রক্ত থেকে চলে যেতে পারে।

HBeAg - **এইচ বি ই এ এজি** হেপাটাইটিস বি ই এন্টিজেন (hepatitis B e antigen) : হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের মধ্যে এই বিশেষ এন্টিজেন পাওয়া যায়। এই এন্টিজেন এর উপস্থিতি সংক্রমনের বর্তমান মাত্রা নির্দেশ করে।

Anti-HBs - **এন্টি এইচ বি এস** এন্টিবডি টু হেপাটাইটিস বি সারফেস এন্টিজেন (antibody to hepatitis B surface antigen) : শরীর এই এন্টিবডি টি তৈরী করে হেপাটাইটিস বি সারফেস এন্টিজেন প্রকাশ পাবার পর। পজেটিভ (positive) রেজাল্ট নির্দেশ করে অতীতের ভাইরাস সংক্রমিত হয়েছিল বা সফল টিকাদান (ভ্যাকসিনেশন)। এই এন্টিবডি ভবিষৎ এ হেপাটাইটিস বি ভাইরাস সংক্রমন থেকেও শরীরকে রক্ষা করবে।

Anti-HBc - **এন্টি এইচ বি সি** এন্টিবডি টু হেপাটাইটিস বি কোর এন্টিজেন (antibody to epatitis B core antigen) : শরীর এই এন্টিবডি টি তৈরী করে হেপাটাইটিস বি কোর এন্টিজেন প্রকাশ পাবার পর। "পজেটিভ (positive)" অথবা "রিএক্টিভ (reactive)" রেজাল্ট নির্দেশ করে অতীতে সংক্রমন হয়েছে।

যদি একজন ব্যক্তির ল্যবরেটরী পরীক্ষায় হেপাটাইটিস বি সনাক্ত হয় তখন আরো কিছু টেস্ট এর প্রয়োজন হয়। যে টেস্ট গুলো দ্বারা রক্তে ভাইরাসের উপস্থিতির মাত্রা নির্ণয় এবং হেপাটাইটিস বি ইএন্টিজেনস এবং এন্টিবডির মাত্রা চিকিৎসার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

HBeAg - **এইচবি ইএজি** (হেপাটাইটিস 'বি' ই-এন্টিজেন) চিকিৎসা চলাকালে শরীরে ইএন্টিজেন তৈরি হয় এবং এইচবিই-এন্টিজেন (HBe Antigen) এর মাত্রার মাধ্যমে চিকিৎসকেরা চিকিৎসার কার্যকারীতা পর্যবেক্ষণ করেন।

Anti-HBe - **এন্টি- এইচবিই** (এইচবিই -এবি) হেপাটাইটিস বি ভাইরাস ই এন্টিবডিস : শরীর এই এন্টিবডি তৈরি করে যখন রক্তে হেপাটাইটিস বি ই-এন্টিজেন প্রকাশ পায়। চিকিৎসকেরা এই এন্টিবডির উপস্থিতির মাধ্যমে চিকিৎসার সফলতা নির্ণয় করেন।

HBV DNA - **এইচবিভি ডিএনএ :** এই টেস্ট রক্তে হেপাটাইটিস বি এর ডিএনএ সম্পর্কে তথ্য দেয়। এই টেস্ট গুলো সাধারনত এপরে উল্লেখিত টেস্ট গুলোর সাথে করা হয়। এটা একটি ব্যয়বহুল পরীক্ষা, রোগের সঠিক অবস্থা, চিকিৎসা পদ্ধতি ও সার্বিক ফলাফল এর দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। এন্টিভাইরাল ট্রিটমেন্ট পর্যবেক্ষনে ব্যবহার করা হয়।

হেপাটাইটিস বি ম্যানেজমেন্ট

রক্ত পরীক্ষায়, আপনার শরীরে হেপাটাইটিস বি ভাইরাস সংক্রমিত হয়েছে বা আছে জানতে পারাটা আপনার জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক কিন্তু ভাল খবরটা হচ্ছে বেশীর ভাগ ক্রনিক হেপাটাইটিস আক্রান্ত ব্যক্তিই দীর্ঘ ও সুস্থ্য জীবন নিয়ে বেচে থাকতে পারে।

সবসময় হেপাটাইটিস বি এর ম্যানেজমেন্ট ও চিকিৎসায় সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে এবং প্রতি বছরই এই চিকিৎসা আরও আধুনিকতর হচ্ছে। একজন ভাল চিকিৎসক খুজে বের করা যিনি সব সময় আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান রাখছেন এবং তার সাথে চাহিদা মত যোগাযোগ করা যাচ্ছে। লিভার অকার্যকর হচ্ছে কিনা এটা জানার সবচেয়ে কার্যকরী পরীক্ষা হলো লিভার ফাংশন ব্লাড টেস্ট এবং লিভার বায়োপসী। লিভারে ক্যান্সার হয়েছে কিনা পরীক্ষার জন্য মাঝে মাঝে আল্ট্রাসাউন্ড টেস্ট করা হয়ে থাকে।

যদিও হেপাটাইটিস বি ভাইরাস আক্রান্ত হবার কারনে আপনার লিভার খানিকটা ড্যামেজ বা অকার্যকর হয়ে যেতে পারে আবার নাও হতে পারে। এটা খুবই জরুরী যে, বাড়তি লিভার ড্যমেজ এর ব্যপারে সর্তক থাকা। বিভিন্ন বস্তুর কারনে লিভার ড্যামেজ হতে পারে। স্বাস্থ্যকর লিভার এর জন্য এটা খুব একটা সমস্যার সৃষ্টি করে না কিন্তু ক্রনিক হেপাটাইটিস বি এর ক্ষেত্রে এর বাড়তি যত্ন নেওয়া জরুরী। মনে রাখবেন আপনার খাদ্য, শ্বাস-প্রশ্বাস এবং চামড়ার মাধ্যমে শরীরে যে সব বস্তু প্রবেশ করে তার সবই লিভার হয়ে শরীরের অনান্য অংশে পৌছায়। কিছু নিয়ম আক্রান্ত

ব্যক্তিরা মেনে চললে এই বাড়তি লিভার ড্যামেজ হবার সম্ভবনা থেকে বাচতে পারেন যেমন: মদ্যপান পরিহার করা, হেপাটাইটিস 'এ' ও 'ই' পরীক্ষা করা ও প্রতিশেধোক টিকা নেওয়া, শরীরের ওজন স্বাস্থ্যসম্মত রাখা, স্বাস্থ্যসম্মত খাবার গ্রহন - অধিক ফ্যাট লিভারের ক্ষতি করে, শরীরের অনান্য অঙ্গ প্রতঙ্গ এর যত্ন নেওয়া ও নিয়মিত সেগুলোর পরীক্ষা করা এবং নিয়মিত ভাবে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া। মনে রাখবেন লিভার ড্যামেজ ও লিভার ক্যান্সার প্রতিহত করতে প্রাথমিক পর্যয়েই তা নির্ণয় করা অত্যন্ত জরুরী।

হেপাটাইটিস বি চিকিৎসা

সাধারনত একিউট হেপাটাইটিস বি এর জন্য কোন চিকিৎসা নেবার প্রয়োজন হয় না। কিছু লক্ষন দেখা দেয় যেমন জন্ডিস, বমি বমি ভাব,বমি হওয়া এবং স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে দূর্বলতা অনুভূত হওয়া, এ সব কারনে এই সময়টায় প্রয়োজনী বিশ্রাম নেওয়া জরুরী। কিছু ব্যক্তি যে ছোটবেলা থেকেই হেপাটাইটিস বি ভাইরাসে আক্রান্ত তা তার কাছে অজানা থেকে যায় এবং পরবর্তীতে ক্রমিক হেপাটাইটিস বি এ রুপান্তরিত হবার ফলে তার উপসর্গ গুলো দেখা যায় । খুবই অল্প সংখ্যক ব্যক্তির মাঝেই একিউট হেপাটাইটিস বি অবস্থাতেই গুরুতর উপসর্গ দেখা দেয় তাকে ফালমিনেন্ট হেপাটাইটিস (fulminant hepatitis) বলে যার চিকিৎসার জন্য হাসপাতলে ভর্তি হওয়া জরুরী হয়ে পরে। বেশীর ভাগ ব্যক্তির ক্ষেত্রেই একিউট হেপাটাইটিস বি এর অল্প উপসর্গ দেখা দেয় এবং তা ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যেই ভাল হয়ে যায়।

তার মানে, সেই ব্যক্তি হেপাটাইটিস বি থেকে মুক্ত এবং সে পরবর্তীতে হয়ত আর কখনও হেপাটাইটিস বি ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হবে না কারন তখন তার শরীর হেপাটাইটিস বি ইমিউন বা প্রতিরোধক হয়ে গেছে।

ক্রমিক হেপাটাইটিস বি এর ক্ষেত্রে চিকিৎসার প্রয়োজন হয়, লিভারে ক্ষতির পরিমান কমাতে ও লিভারে এই ভাইরাসের বিস্তার রোধ করতে। আপনি যখনই ল্যবরেটরী পরীক্ষায় হেপাটাইটিস বি ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন তা জানতে পারবেন তখনই আপনার উচিৎ লিভার রোগ বিশেষজ্ঞ (হেপাটোলজীস্ট - Hepatologiest) বা পরিপাকতন্ত্র বিশেষজ্ঞ (গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজীস্ট - Gastroenterologist) এর স্বরনাপন্য হওয়া।

তিনি পরীক্ষা করবেন, আপনি এই ভাইরাসে কত দিন হলো আক্রান্ত হয়েছেন, ভাইরাসের কার্যক্রম (এটা বৃদ্ধি পাচ্ছে কি না) এবং আপনার লিভারে এই ভাইরাস কোন ক্ষতি সাধন করেছে কি না। এসব বিষয় জানার পর বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আপনার জন্য উপযুক্ত চিকিৎসা পরিকল্পনা তৈরি করবেন।

যদি চিকিৎসকেরা হেপাটাইটিস বি আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসার প্রয়োজনীতা অনুভব করেন তখন তারা প্রচলিত প্রধান দুটি পদ্ধতির সাহায্য নিতে পারেন একটি হলো ইন্টারফেরন থেরাপী যেমন ইন্টারফেরন আলফা বা প্যগিলেটেড ইন্টারফেরন, আরেকটি মুখে খাবার টেবলেট নিউক্লিওসাইড

বা নিউক্লিওটাইড এজেন্ট যেমন টেনোফোভির, ইন্টাকাভির, ল্যামিভুডিন, এ্যাডিফোভির বা টেলবিভুডিন।

Interferon-alpha - ইন্টারফেরন আলফা হলো ইনজেকটেড ঔষধ যা সপ্তাহে তিন বার ইনেজেকশনের মাধ্যমে শরীরে দেওয়া হয়। এটা ভাইরাস কে নিষ্ক্রিয় করতে শরীরকে সাহায্য করে। এই ঔষধ ব্যবহার কালে কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে যেমন ফ্লুর মত লক্ষন, অবসাদ এবং মাথাব্যথা। এফডিএ (FDA) এই ঔষধ কে অনুমোদন দিয়েছে রোগীর হেপাটাইটিস বি এর চিকিৎসার জন্য ১৯৯১ সালে।

Pegylated Interferon - **প্যগিলেটেড ইন্টারফেরন** হলো 'ইন্টারফেরন আলফা' এর পরিবর্ধিত ইনজেকটেড ঔষধ। যা সপ্তাহে এক বার ইনেজেকশনের মাধ্যমে শরীরে দেওয়া হয়।। এটা ভাইরাস কে নিষ্ক্রিয় করতে শরীর কে সাহায্য করে। এই ঔষধ ব্যহার কালে কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে যেমন ফ্লুর মত লক্ষন, অবসাদ এবং মাথাব্যথা। এফডিএ (FDA) এই ঔষধ কে অনুমোদন দিয়েছে প্রাপ্তবয়স্ক রোগীর হেপাটাইটিস বি এর চিকিৎসার জন্য ২০০৫ সালে।

Tenofovir - **টেনোফোভির** হলো মুখে খাবার ঔষধ যা দিনে একটি করে খেতে হয়। ক্রনিক হেপাটাইটিস বি চিকিৎসার প্রাথমিক পর্যায়ের ডিনোভো (শুরুর দিকের) চিকিৎসার ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

Entecavir - **এন্টেকাভির** হলো মুখে খাবার ঔষধ যা দিনে একটি করে খেতে হয়। এই ঔষধে কিছু পার্শপ্রতিক্রিয়া আছে তার মদ্যে একটি হলো কিডনী সমস্যা, সে কারনে চিকিৎসক দের এই সময় রোগীদের বাড়তি মনোযোগ দিতে হয়। এফডিএ (FDA) এই ঔষধ কে অনুমোদন দিয়েছে রোগীর হেপাটাইটিস বি এর চিকিৎসার জন্য ২০০২ সালে।

Lamivudine - **ল্যামিভুডিন** হলো মুখে খাবার ঔষধ যা দিনে একটি করে খেতে হয়। এই ঔষধে কোন পার্শপ্রতিক্রিয়া নেই। এফডিএ (FDA) এই ঔষধ কে অনুমোদন দিয়েছে আক্রান্ত ব্যক্তির হেপাটাইটিস বি এর চিকিৎসার জন্য ১৯৯৮ সালে।

Adefovir - **এ্যাডিফোভির** হলো মুখে খাবার ঔষধ যা দিনে একটি করে খেতে হয়। এই ঔষধে কিছু পার্শপ্রতিক্রিয়া আছে তার মধ্যে একটি হলো কিডনী সমস্যা, সে কারনে চিকিৎসক দের এই সময় রোগীদের বাড়তি মনোযোগ দিতে হয়। এফডিএ (FDA) এই ঔষধ কে অনুমোদন দিয়েছে রোগীর হেপাটাইটিস বি এর চিকিৎসার জন্য ২০০২ সালে।

Telbivudine - **টেলবিভুডিন** ক্রনিক হেপাটাইটিস বি সংক্রমনের চিকিৎসার জন্য লাইসেন্স প্রাপ্ত

মুখে খাবার ঔষধ কিন্তু অতি ব্যয়বহুল হওয়ার কারনে এনআইসিই (NICE) একে ব্যবহারে উৎসাহী করে না।

গর্ভাবস্থায় হেপাটাইটিস বি

জন্মের সময় হেপাটাইটিস বি আক্রান্ত মা থেকে এই ভাইরাস নবজাতকে সংক্রমিত হতে পারে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, শরীরে সংক্রমিত হেপাটাইটিস বি ইনফেকশন প্রতিহত করতে বয়স একটা বড় বিষয়। জন্ম নেবার সময় আক্রান্ত নবজাতক কে সারা জীবন এই ভাইরাস শরীরে বয়ে বেড়াতে হবে। এই ভাইরাস প্রতিরোধে টিকা এবং ঔষধ আছে বিধায় প্রত্যেকটি গর্ভবতী মহিলার এর উচিৎ তার সন্তান জন্ম দেবার আগে হেপাটাইটিস বি পরীক্ষা করে নেওয়া।

যদি একজন গর্ভবতী মহিলা হেপাটাইটিস বি পরীক্ষায় পজেটিভ হন তাহলে চিকিৎসক তার নকজাতকের যেন এই ভাইরাস সংক্রমিত না হয় তার ব্যবস্থা করবেন। তার পরিবার এর অন্য সদস্যদেরও উচিৎ হবে হেপাটাইটিস বি পরীক্ষা করে নেওয়া এবং রেজাল্ট নেগেটিভ হলে প্রতিরোধোক টিকা নিয়ে নেওয়া। আক্রান্ত গর্ভবতী মহিলার শিশু জন্ম নেবার ২৪ ঘন্টার মধ্যে তাকে হেপাটাইটিস বি প্রতিশোধক টিকা, বার্থডোজ এবং সাথে ইমিউনোগ্লোবিউলিন (immuno-globulin) দিতে হবে। এই ব্যবস্থা নিলে নবজাতকের শরীরে তার মা থেকে হেপাটাইটিস বি ভাইরাস সংক্রমনের সম্ভবনা থাকবেনা।

হেপাটাইটিস সি

Hepatitis C

হেপাটাইটিস সি

হেপাটাইটিস সি ভাইরাস এর কারনে লিভার কোষ (Liver cell) এ প্রদাহ হলে হেপাটাইটিস সি বলে। এই ভাইরাসের প্রধান আক্রমনের স্থান হলো লিভার। এই ভাইরাস খুব দ্রুত ইনফেকশন লিভারে ছড়িয়ে জীবনের জন্য মারাত্বক হুমকি স্বরুপ লিভার প্রদাহ সৃষ্টি করতে পারে। বেশীর ভাব ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, এই ভাইরাস সংক্রমনের মাধ্যমে খুবই ধীরে, অনেক সময় নিয়ে লিভার কে অকেজো করে দেয়। লিভার এ প্রদাহ, লিভার সংকীর্ণ হয়ে যাওয়া ফাইব্রোসিস (Fibrosis), ব্যাপক আকারে লিভার অকেজো করে দেওয়া সিরোসিস (Cirrhosis) এমনকি লিভার ক্যান্সার, হেপাটো সেলুলার কারসিনোমা (Hepatocellular carcinoma) এবং সবশেষে লিভার ফেইলার হতে পারে।

হেপাটাইটিস সি ভাইরাস কে বলা হয় **'নীরব ঘাতক'** কারন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য লক্ষনীয় লক্ষণ দেখা যায় না। কিছু সংখ্যক ব্যক্তি (২০%) এই ভাইরাস আক্রমনের প্রথম কয়েক মাসের মধ্যেই তার সাথে লড়াই করে তাকে শরীর থেকে বিতারিত করে এবং ভাল থাকে। যখন কেউ প্রথম এই ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন একে বলা হয় স্বল্পমেয়াদী বা একিউট ইনফেকশন কিন্তু যদি এই ভাইরাস কার রক্তে ছয় (০৬) মাসের অধিক অবস্থান করে তখন একে বলা হয় দীর্ঘমেয়াদী বা ক্রনিক (Chronic) ইনফেকশন। বিশেষজ্ঞদের মতে হেপাটাইটিস সি ভাইরাস আক্রান্ত প্রতি ৫ জনে ৪ জন দীর্ঘমেয়াদী বা ক্রনিক ইনফেকশন এ রুপান্তরিত হবার আশংকা থাকে। হেপাটাইটিস সি লিভার রোগের এবং লিভার ট্রান্সপ্লান্ট (প্রতিস্থাপন) করার প্রধান কারন।

হেপাটাইটিস সি ভাইরাস শরীরে প্রবেশের পরই রক্তে এর মাত্রা নাটকীয় ভাবে বাড়তে থাকে যতক্ষন না শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা (Body's immune system - বডি'স ইম্মিউন সিস্টেম), এন্টিবডি তৈরি করে। রক্তে হেপাটাইটিস সি ভাইরাস অবস্থান কালেই কেবল হেপাটাইটিস সি প্রতিশেধোক এন্টিবডি তৈরি হয়। যদিও শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা (বডি'স ইম্মিউন সিস্টেম) হেপাটাইটিস সি ভাইরাস এর সাথে লড়াই করে তারপরও ৭৫% ব্যক্তিই এই লড়াই এ পরাজিত হয় এবং তারা এ ভাইরাস শরীরে সারা জীবন বহন করে। একেই বলে দীর্ঘমেয়াদী বা ক্রনিক ইনফেকশন।

কত সংখ্যক মানুষ হেপাটাইটিস সি ভাইরাস এ আক্রান্ত ?

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার(WHO) রিপোর্ট অনুযায়ী বিশ্বে প্রতি বছর ১৭ কোটি মানুষ দীর্ঘমেয়াদী হেপাটাইটিস সি ভাইরাস ইনকেশন আক্রান্ত হয় এবং প্রায় ৩.৫ লক্ষ মানুষ মৃত্যু বরণ করে।
আমাদের দেশের প্রায় শতকরা ১-৩ ভাগ মানুষ হেপাটাইটিস সি ভাইরাসের বাহক (সঠিক পরিসংখ্যান জানা যায়নি), তাদের মধ্যে অনেকেই দীর্ঘমেয়াদী ইনকেশন এ নানাবিধ জটিল লিভার রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। মনে রাখতে হবে যে, হেপাটাইটিস সি ভাইরাস, এইডস ভাইরাসের চেয়ে অনেক বেশী সংক্রামক।

হেপাটাইটিস সি এর লক্ষণ সমূহ

বেশীর ভাগ ব্যক্তির ক্ষেত্রেই **কোন লক্ষণ থাকে না** এবং কোন ধারনাও থাকে যে, সে হেপাটাইটিস সি ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত যতক্ষণ না পর্যন্ত চিকিৎসকেরা রক্ত পরীক্ষা করে হেপাটাইটিস সি এর উপস্থিতি নিশ্চিত করেন।

যদি এর লক্ষণ সমূহ দেখা দেয়, যার ধরণ এবং ঝুঁকির মাত্রা ভিন্ন হতে পারে।

সাধারন লক্ষণ :

- জ্বর
- শারীরিক অবসাদ
- দুর্বলতা
- মাংশপেশী ও হাড়ের জয়েন্ট এ ব্যথা
- বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া

বিরল লক্ষণ :

- ব্যাপক বমি হবার ফলে পানি শূন্যতা
- জন্ডিস (শরীর, চোখ ও গাঢ় মূত্রে হলদেটে ভাব)
- বর্ধিত পেট (এ্যসাইটিস- Ascites)।

হেপাটাইটিস সি কি কি ভবে এই রোগ সংক্রমিত হয়?

হেপাটাইটিস সি ভাইরাস খুবই সংক্রমিত একটি ভাইরাস। আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত বা শরীরের অন্যান্য তরল (বডি ফ্লুইড), ভ্যাজাইন্যাল তরল পদার্থ রক্তের সংস্পর্শের মাধ্যমে ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে হেপাটাইটিস সি সংক্রমিত করে। যেমন :

- সরাসরি রক্ত থেকে রক্তে (নিরীক্ষাবিহীন রক্ত এবং রক্তের উপাদান পরিসঞ্চালন দ্বারা)
- সূচ এর মাধ্যমে (একই সূচ ব্যবহার করে একাধিক ব্যক্তির নেশা জাতীয় দ্রব্যাদি গ্রহনের সময়, নাঁক-কান ফুরানো বা টেটু করানো)
- বিভিন্ন রকম চিকিৎসা (মেডিকেল ও ডেন্টাল) গ্রহন কালে দূষিত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের
- ব্যক্তিগত জিনিস একাধিক ব্যক্তির ব্যবহারের ফলে (যেমন: দাঁতের ব্রাশ, রেজার, ক্ষুর, ব্লেড)
- অরক্ষিত যৌন ক্রিয়া

হেপাটাইটিস সি আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে সামাজিক মেলামেশায় এই রোগ ছড়াতে পারে কি ?

সামাজিক মেলামেশায় (হ্যান্ডশেক, কোলাকুলি) এই রোগ ছড়ায় না। এমনকি হেপাটাইটিস সি আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহার্য দ্রব্যাদি যেমন: গ্লাস, প্লেট, কাপ, চামচ, জামা-কাপড় ইত্যাদির মাধ্যমেও এই রোগ ছড়ায় না। শুধুমাত্র যে সমস্ত দ্রব্য রোগীর রক্তের সংস্পর্শে আসে (ক্ষুর, ব্লেড, রেজার, দাঁতের ব্রাশ, সূচ) সেগুলোর মাধ্যমেই এই রোগ ছড়াতে পারে।

হেপাটাইটিস সি আক্রান্ত হবার ঝুঁকিতে আছেন যারা

- ইনজেকশন দিয়ে যারা নেশা গ্রহন করেন।
- হেপাটাইটিস সি আক্রান্তের পরিবারের ঘনিষ্ঠ জনেরা এবং তার সঙ্গি বা সঙ্গিনী।
- স্বাস্থ্য সেবায় নিয়োজিত কর্মীরা, যারা রক্তের সংস্পর্শে প্রায়শই আসেন, যেমন: শল্য চিকিৎসক, ডায়ালইসিস ইউনিট ও রক্ত সঞ্চালন বিভাগের কর্মীরা, দাঁতের ডাক্তার, সেবিকা ও ধাত্রীগণ।
- হেপাটাইটিস সি আক্রান্ত মায়ের নবজাতক।

হেপাটাইটিস সি সংক্রমন কি ভাবে প্রতিরোধ করতে পারি ?

দুঃখজনক হলো হেপাটাইটিস সি ভাইরাস প্রতিরোধের কোন প্রতিশেধোক টিকা নেই। আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত বা শরীরের অন্যান্য তরল বডি ফ্লুইড (Body fluid), ভ্যাজাইন্যাল তরল এর সংস্পর্শ পরিহার এর মাধ্যমে এই ভাইরাস এর সংক্রমন প্রতিরোধ করা সম্ভব। এছাড়াও রক্ত বা রক্তের উপাদান পরিসঞ্চালনার সময় অবশ্যই পরীক্ষিত স্ক্রিনিং (Screening) রক্ত ব্যবহার করা এবং সেলুনে, হাটে-বাজারে চুল কাটা বা সেভ করার সময় অন্যের ব্যবহৃত ব্লেড ব্যবহার করা থেকে বিরত থেকে এই ভাইরাস এর সংক্রমন প্রতিরোধ করা সম্ভব।

হেপাটাইটিস সি এর ল্যবরেটরী রক্ত পরীক্ষা সমূহ

রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে হেপাটাইটিস সি রোগ নির্নয় এবং এর সঠিক চিকিৎসা নির্নয় করা হয়। সাধারণত ৬ মাস পর এই রক্ত পরীক্ষা গুলো আবার কারানো হয় বোঝার জন্য যে, আক্রান্ত ব্যক্তি কি এই ভাইরাস থেকে পরিত্রান পেয়েছে, না কি দীর্ঘমেয়াদী বা ক্রনিক ইনফেকশন এ আক্রান্ত হয়েছে। হেপাটাইটিস সি আক্রান্ত প্রত্যেকেরই উচিৎ, ল্যবরেটরী রিপোর্ট নিয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছ থেকে সঠিক পরামর্শ নেওয়া। কিছু জরুরী শব্দ যেগুলো হেপাটাইটিস সি রোগ নির্নয় এর ল্যবরেটরী রিপোর্টে পাওয়া যায়:

এন্টিজেন (Antigen) : শরীরের কোন ফরেন সাবস্টেন্স যেমন হেপাটাইটিস সি ভাইরাস এর প্রোটিন কে এন্টিজেন বলে।

এন্টিবডি (Antibody) : হেপাটাইটিস সি এর এন্টিজেন কে প্রতিহতো করার জন্য শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা (বডি'স ইম্মিউন সিস্টেম) যে প্রোটিন তৈরি করে তাকে এন্টিবডি বলে। এই এন্টিবডি প্রতিরোধক এন্টিবডি নয়। যদি কোন ব্যক্তির শরীরে হেপাটাইটিস সি এন্টিবডি পজেটিভ পাওয়া যায় তাহলে বুঝতে হবে তা তাৎক্ষনিক বা পূর্বের হেপাটাইটিস সি ইনফেকশন।

এইচসিভি আরএনএ (HCV RNA) : হেপাটাইটিস সি ভাইরাসের জেনেটিক ম্যটেরিয়াল। রক্তে এইচসিভি আরএনএ (HCV RNA) সনাক্ত হলে বুঝতে হবে তা তাৎক্ষনিক সি ইনফেকশন।

ভাইরাল লোড (Viral load) : রক্তে ভাইরাসের পরিমান। হেপাটাইটিস সি এর ক্ষেত্রে ভাইরাল লোড লিভার ড্যামেজ এর সাথে সম্পর্কযুক্ত না। এটা হেপাটাইটিস সি চিকিৎসায় প্রভাব ফেলে। এই টেস্ট কে বলা হয় "কোয়ানটিটেটিভ টেস্ট (quantitative test)" ।

জেনোটাইপ (Genotype) : হেপাটাইটিস সি ভাইরাসের প্রকার (type)। হেপাটাইটিস সি এর ৬ রকম জেনোটাইপ আছে (১,২,৩,৪,৫ এবং ৬)। এই সবগুলোই হেপাটাইটিস সি ভাইরাস কিন্তু এদের মধ্যে কিছু গঠনগত সামান্য পার্থক্য আছে। হেপাটাইটিস সি চিকিৎসা পরিকল্পনার জন্য জেনোটাইপ খুবই গুরুত্বপূর্ন।

হেপাটাইটিস সি ম্যানেজমেন্ট

রক্ত পরীক্ষায়, আপনার শরীরে হেপাটাইটিস সি ভাইরাস সংক্রমিত হয়েছে বা আছে জানতে পারাটা আপনার জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক কিন্তু ভাল খবরটা হচ্ছে বেশীর ভাগ ক্রনিক হেপাটাইটিস আক্রান্ত ব্যক্তিই দীর্ঘ ও সুস্থ্য জীবন নিয়ে বেচে থাকতে পারে।

সবসময় হেপাটাইটিস সি এর ম্যানেজমেন্ট ও চিকিৎসায় সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে এবং প্রতি বছরই এই চিকিৎসা আরও আধুনিকতর হচ্ছে। একজন ভাল চিকিৎসক খুজে বের করা যিনি সব সময় আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান রাখছেন এবং তার সাথে স যোগাযোগ করা।

যদিও হেপাটাইটিস সি ভাইরাস আক্রান্ত হবার কারনে আপনার লিভার খানিকটা ড্যামেজ বা অকার্যকর হয়ে যেতে পারে আবার নাও হতে পারে। এটা খুবই জরুরী যে, বাড়তি লিভার ড্যমেজ এর ব্যপারে সর্তক থাকা। বিভিন্ন বস্তুর কারনে লিভার ড্যামেজ হতে পারে। স্বাস্থ্যকর লিভার এর জন্য এটা খুব একটা সমস্যার সৃষ্টি করে না কিন্তু ক্রনিক হেপাটাইটিস সি এর ক্ষেত্রে এর বাড়তি যত্ন নেওয়া জরুরী। মনে রাখবেন আপনার খাদ্য, শ্বাস-প্রশ্বাস এবং চামড়ার মাধ্যমে শরীরে যে সব বস্তু প্রবেশ করে তার সবই লিভার হয়ে শরীরের অনান্য অংশে পৌছায়। কিছু নিয়ম আক্রান্ত ব্যক্তিরা মেনে চললে এই বাড়তি লিভার ড্যামেজ হবার সম্ভবনা থেকে বাচতে পারেন যেমন: মদ্যপান পরিহার করা, হেপাটাইটিস 'বি' ও হেপাটাইটিস 'এ' পরীক্ষা করা ও প্রতিশেধোক টিকা নেওয়া, , শরীরের ওজন স্বাস্থ্যসম্মত রাখা, স্বাস্থ্যসম্মত খাবার গ্রহন - অধিক ফ্যাট লিভারের ক্ষতি করে, শরীরের অনান্য অঙ্গ প্রতঙ্গ এর যত্ন নেওয়া ও নিয়মিত সেগুলোর পরীক্ষা করা এবং নিয়মিত ভাবে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া। মনে রাখবেন লিভার ড্যামেজ ও লিভার ক্যান্সার প্রতিহত করতে প্রাথমিক পর্য্যায়েই তা নির্ণয় করা অত্যন্ত জরুরী।

হেপাটাইটিস সি চিকিৎসা

ক্রমিক হেপাটাইটিস সি এর ক্ষেত্রে চিকিৎসার প্রয়োজন হয়, লিভারে ক্ষতির পরিমান কমাতে ও লিভারে এই ভাইরাসের বিস্তার রোধ করতে। আপনি যখনই ল্যবরেটরী পরীক্ষায় হেপাটাইটিস সি ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন তা জানতে পারবেন তখনই আপনার উচিৎ লিভার রোগ বিশেষজ্ঞ (হেপাটোলজীস্ট - Hepatologiest) বা পরিপাকতন্ত্র বিশেষজ্ঞ (গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজীস্ট - Gastroenterologist) এর স্বরনাপন্য হওয়া। তিনি তখন পরীক্ষা করবেন, আপনি এই ভাইরাসে কত দিন হলো আক্রান্ত হয়েছেন, ভাইরাসের কার্যক্রম (এটা বৃদ্ধি পাচ্ছে কি না) এবং আপনার লিভারে এই ভাইরাস কোন ক্ষতি সাধন করেছে কি না। এসব বিষয় জানার পর বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আপনার জন্য উপযুক্ত চিকিৎসা পরিকল্পনা তৈরি করবেন।

যদি চিকিৎসকেরা হেপাটাইটিস সি আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসার প্রয়োজনীতা অনুভব করেন তখন তারা প্রচলিত ইন্টারফেরন থেরাপী যেমন প্যগিলেটেড ইন্টারফেরন আলফা (Pegylated Interferon alpha) ও সাথে মুখে খাবার টেবলেট রিবাভিরিন (Ribavirin) দিয়ে চিকিৎসা দেন।

Interferon-alpha - **ইন্টারফেরন আলফা** হলো ইনজেকটেড ঔষধ যা সপ্তাহে তিন বার ইনেজেকশনের মাধ্যমে শরীরে দেওয়া হয়। এটা ভাইরাস কে নিস্ক্রিয় করতে শরীর কে সাহায্য করে। এই ঔষধ ব্যহার কালে কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে যেমন ফ্লুর মত লক্ষন, অবসাদ এবং মাথাব্যথা।

Pegylated Interferon - **প্যগিলেটেড ইন্টারফেরন** হলো 'ইন্টারফেরন আলফা' এর পরিবর্ধিত ইনজেকটেড ঔষধ। যা সপ্তাহে এক বার ইনেজেকশনের মাধ্যমে শরীরে দেওয়া হয়। এটা ভাইরাস কে নিস্ক্রিয় করতে শরীর কে সাহায্য করে। এই ঔষধ ব্যহার কালে কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে যেমন ফ্লুর মত লক্ষন, অবসাদ এবং মাথাব্যথা।

Ribavirin - **রিবাভিরিন** হলো মুখে খাবার এন্টি-ভাইরাল ঔষধ দিনে দুই বার খেতে হয়।এই ঔষধ একক ভাবে হেপাটাইটিস সি ভাইরাস এর উপড় কোন প্রভাবই পেলতে পারে না কিন্তু এটা ব্যবহার করা হয় ইনটারফেরনের কার্যকারীতা বাড়ানোর জন্য।

গর্ভাবস্থায় হেপাটাইটিস সি

হেপাটাইটিস সি আক্রান্ত গর্ভবতী মায়েরা তার নবজাতকে এই ভাইরাস সংক্রন এর ভয়ে উদ্বিগ্ন থাকেন। কিন্তু জন্মের সময় মা থেকে নবজাতকে এই ভাইরাস সংক্রমনের সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। পরিসংখ্যানে দেখা যায় হেপাটাইটিস সি আক্রান্ত গর্ভবতী মা থেকে নবজাতকে হেপাটাইটিস সি সংক্রমনের হার প্রায় ৫%।

সবচেয়ে জরুরী বিষয় হলো হেপাটাইটিস সি চিকিৎসায় ব্যবহৃত ঔষধ ভ্রুণ এর জন্য অতন্ত্য বিপদজনক। হেপাটাইটিস সি চিকিৎসায় ব্যবহৃত ঔষধ রিবাভিরিন, নবজাতকের বার্থ ডিফেক্ট বা জন্মগত ত্রুটির কারন হতে পারে সে কারনে যে সব মহিলা ও পুরুষ রিবাভিরিন ঔষধ ব্যবহার করেন তাদের অবশ্যই উচিৎ জন্মনিয়ন্ত্রন পদ্ধতি ব্যবহার করে গর্ভধারন রোধ করা।

লিভার ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ

বাংলাদেশের জনগনের এক বিরাট অংশ বিভিন্ন রকম লিভার রোগে আক্রান্ত। এদের মধ্যে শতকরা ৪ থেকে ৭% মানুষ হেপাটাইটিস বি ভাইরাসে এবং ১ থেকে ৩% মানুষ হেপাটাইটিস সি ভাইরাসে আক্রান্ত, এছাড়াও গর্ভবতী মায়েদের মধ্যে ৩.৫% হেপাটাইটিস বি ভাইরাসে আক্রান্ত। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশ হেপাটাইটিস 'বি' ও 'সি' এর প্রকপের দিক দিয়ে ইন্টারমিডিয়েট জোন এ রয়েছে। বাংলাদেশের প্রায় ৮ থেকে ১৬ মিলিয়ন মানুষ হেপাটাইটিস 'বি' অথবা 'সি' ভাইরাসে আক্রান্ত। বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হিসাব অনুযায়ী প্রতিবছর প্রায় ১২ থেকে ২৫ হাজার মানুষ হেপাটাইটিস 'বি' অথবা 'সি' ভাইরাসে আক্রান্ত হচ্ছে।

এই দুই ভাইরাস ছাড়াও লিভার রোগের বিভিন্ন কারনের মধ্যে আছে ভাইরাল ও নন-ভাইরাল কারন। আমাদের দেশে লিভার রোগের সচেতনতা ও চিকিৎসা কেন্দ্র খুবই সীমিত এবং অল্প কিছু প্রতিষ্ঠানে এর চিকিৎসা হয়। লিভার রোগের বেশীর ভাগ পরীক্ষা, হস্তক্ষেপমূলক চিকিৎসা ও ঔষধ অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং দীর্ঘমেয়াদী। বেশীর ভাগ সাধারন মানুষের পক্ষেই এই ব্যবহুল ও দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব না, বিশেষ করে যে সব পরিবারের একাধিক সদস্য ভাইরাস জনিত লিভার রোগে আক্রান্ত তাদের পক্ষে এটা আরো কষ্টোসাধ্য। আশার কথা এই যে, সচেতনতার মাধ্যমে বেশীর ভাগ লিভার রোগই প্রতিরোধ করা সম্ভব।

১৯৯৯ সালে কয়েকজন নিবেদিত প্রাণ চিকিৎসক ও সমাজকর্মীর প্রচেষ্টায় লিভার ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা হয়। এটি বাংলাদেশে লিভার রোগের প্রতিরোধ, চিকিৎসা, শিক্ষা ও গবেষণাকল্পে প্রতিষ্ঠিত একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠিত লিভার ফাউন্ডেশনের আদলে সৃষ্ট এই ফাউন্ডেশনই বাংলাদেশের প্রথম। এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম ব্যয় নির্বাহ করা হয় বিভিন্ন দাতা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অনুদানে। এই প্রতিষ্ঠানের সকল আয়ই লিভার রোগ আক্রান্ত রোগী ও এই প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে ব্যয় করা হয়।

এই ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমকে ৪ ভাগে ভাগ কার হয়েছে। লিভার ফাউন্ডেশন, প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই লিভার রোগের সচেতনতা ও প্রতিরোধে নিরলশ ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিনামূল্যে হেপাটাইটিস বি টিকাদান কার্যক্রমের আওতায় ইতমধ্যে ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, কুমিল্লা, সিলেট, মৌলভীবাজার ও সুনামগঞ্জ এর সরকারী শিশু পরিবার ও ছোটমনি নিবাস এর কয়েক হাজার এতিম নিবাসীদের হেপাটাইটিস বি টিকাদান সম্পন্ন করা হয়েছে এবং চট্টগ্রাম হেপাটাইটিস দিবস ২০১২ এর আওতায় চট্টগ্রামের পটিয়া, হাটহজারী ও রউফাবাদ সরকারী শিশু পরিবার ও ছোটমনি নিবাস এর নিবাসীদের বিনামূল্যে হেপাটাইটিস বি টিকা প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হেপাটাইটিস সচেতনতা দিবস', ২০০৭ থেকে প্রতি বছর 'বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস' , 'সিলেট হেপাটাইটিস দিবস' এবং বাংলাদেশে হেপাটাইটিস প্রতিরোধে গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন উলেণ্টখযোগ্য।

লিভার ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ প্রতিবছর বাংলা নববর্ষ 'পহেলা বৈশাখ' এ ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয় ও রমনা এলাকায় হেপাটাইটিস প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে, যা ' আমি কি নম্বন ১২?' কর্মসূচী নামে পরিচিত।

লিভার ফাউন্ডেশন নিয়মিত ভাবে ঢাকার মেরি স্টোপেস ক্লিনিক এর গর্ভবতী মা দের বিনামূল্যে হেপাটাইটিস 'বি' ও 'সি' স্ক্রিনিং ও হেপাটাইটিস আক্রান্ত মাদের নবজাতককে জন্মের ২৪ ঘন্টার মধ্যে ব্যয়বহুল ইমিউনোগ্লোবিউলিন ও টিকা প্রদান, মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রের ইন্সট্রাকটরদের হেপাটাইটিস রোগ প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান, চিকিৎসকদের জন্য লিভার রোগ সচেতনতা ও বৈজ্ঞানিক সম্মেলন অনুষ্ঠান এবং সুবিধাবঞ্চিত অস্বচ্ছল হেপাটাইটিস আক্রান্ত পরিবারের চিকিৎসার জন্য অর্থনৈতিক সহযোগীতা করে আসছে।

লিভার ফাউন্ডেশন লিভার রোগ বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ে সরকারী পর্যায়ে এ্যাডভোকেসী করে থাকে। এর মধ্যে উল্যেখ যোগ্য হলো মা ও নবজাতকের হেপাটাইটিস বি ভারটিকাল ট্রান্সমিশন প্রতিরোধে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ইপিআই প্রোগ্রামে হেপাটাইটিস বি বার্থ ডোজ (জন্মের ২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রথম ডোজ হেপাটাইটিস বি টিকা প্রদান, যা বর্তমান ইপিআই সিডিউল এ ৬ সপ্তাহে প্রদান করা হয়) বিষয়ক পরামর্শ প্রদান, এই পরামর্শ সরকার গ্রহন করেছে এবং পর্যায়ক ক্রমে তা বাস্তবায়ন করবে। এছাড়াও লিভার ফাউন্ডেশন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আগামী জাতীয় স্বাস্থ্য নিতিমালায় লিভার রোগ সম্পর্কিত তথ্য ও এর প্রতিরোধে পরিকল্পনা প্রনয়নের জন্য সরকার কে বিভিন্ন ভাবে পরামর্শ প্রদান করছে, উল্লেখ্য খসড়া জাতীয় স্বাস্থ্য নিতিমালায় লিভার রোগ সম্পূর্ণ উপেক্ষিত ছিল।

লিভার ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ জেনেভায় অবস্থিত বিশ্বের হেপাটাইটস প্রতিরোধে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান 'ওয়ার্ল্ড হেপাটাইটস এলায়েন্স' এর একটি সক্রিয় সদস্য। 'ওয়ার্ল্ড হেপাটাইটস এলায়েন্স' এর জাতীয় ও অন্তর্জাতিক পর্যায়ে ভাইরাল লিভার রোগ প্রতিরোধে পরিচারিত বিভিন্ন কমসূচীতে লিভার ফাউন্ডেশন সবসময় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহন করে আসছে।

লিভার ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশের পরিচালিত আন্তর্জাতিক ভাইরাল হেপাটাইটিস সচেতনতা কর্মসূচী গুলো 'ওয়ার্ল্ড হেপাটাইটস এলায়েন্স' এ ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করে আসছে এবং গত ৪ বছর ধরে এই কর্মসূচী গুলোর ছবি 'ওয়ার্ল্ড হেপাটাইটস এলায়েন্স' এর বার্ষিক প্রতিবেন এর প্রচ্ছদ হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।
৬৩ তম বিশ্ব হেলথ এসেম্বলীতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা 'ওয়ার্ল্ড হেপাটাইটস এলায়েন্স' কর্তৃক আবেদনকৃত 'রেজ্যুলুশন অন ভাইরাল হেপাটাইটিস সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং ২৮ জুলাই

কে ‘বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস’ হিসাবে ঘোষনা করা হয়। বিশ্বে হেপাটাইটিস প্রতিরোধের জন্য অত্যন্ত গূরুত্বপূর্ণ এই আবেদনে ‘ওয়ার্ল্ড হেপাটাইটস এলায়েন্স’ এর পক্ষে ১২ জন স্বাক্ষরকারীর একটি হলো লিভার ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ।

বাংলাদেশে লিভার রোগ প্রতিরোধে নিরলস প্রচেষ্টার স্বীকৃতি স্বরুপ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ‘লিভার ফাউন্ডশন অব বাংলাদেশ’ কে সিলেট শহরে লিভার ফাউন্ডেশন হাসপাতাল নির্মানের জন্য একটি জমি প্রদান করেছে।

লিভার ফাউন্ডশন এর কেন্দ্রীয় কার্যলয় ঢাকার পান্থপথে হেপাটোলজীস্ট ও গ্যাস্ট্রো-এন্টারোলজীস্ট নিয়মিত লিভার রোগীদর পরামর্শ দেন। এছাড়াও এখানে সাশ্রই মূল্যে সবরকম ল্যাবরেটরী ও ইমজিং করা হয়ে থাকে।

লিভার ফাউন্ডশন অব বাংলাদেশের মূল লক্ষ্য বাংলাদেশে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আন্তর্জাতিক মানের উৎকর্ষমূলক (সেন্টার অব এক্সেলেন্স) লিভার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা, যা বাংলাদশে লিভার রোগ চিকিৎসা, প্রতিরোধ, শিক্ষা ও গবেষণার কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করবে। এই হাসপাতালে সাশ্যই মূল্যে চিকিৎসা সেবা দেওয়া হবে যেন বাংলাদেশের কোন লিভার রোগীই চিকিৎসা বঞ্চিত না হয়।

লিভার ফাইন্ডেশন অব বাংলাদশ তার কাংঙ্গিত লক্ষ্য অর্জন সবার সহযোগীতা কামনা করছে। আসুন সবাই মিলে বাংলাদেশ হেপাটাইটিস প্রতিরাধ করি।

লিভার ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ
১৫০ (৩য় তলা), গ্রীনরোড, পান্থপথ, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ
ফোন : ৯১৪৬৫৩৭, ০১৭৩২৯৯৯৯২২
ই-মেইল: info@liver.org.bd www.liver.org.bd

“লিভার ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্যই ছিল বাংলাদেশের মানুষ কে বিভিন্ন লিভার রোগ সম্পর্কে সচেতন করা এবং এদেশে ভাইরাল হেপাটাইটিস প্রতিরোধ করা।

হেপাটাইটিস বি এবং সি আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা ও এর প্রতিরোধ সম্পর্কে সঠিক নির্দেশনা ও নানা বিধ বিভ্রান্তি দূর করতে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস ‘হেপাটাইটিস বি এবং সি গাইড বুক’।”

অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী
প্রতিষ্ঠাতা মহাসচিব
লিভার ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ